মুসলমান-অমুসলমান সম্পর্কের সীমা

﴿ حدود علاقة المسلم مع غير المسلم ﴾

[বাংলা - bengali - البنغالية]

লিয়াকত আলী আব্দুস সবুর

সম্পাদনা : ইকবাল হোছাইন মাছুম

2010 - 1431

IslamHouse

﴿ حدود علاقة المسلم مع غير المسلم ﴾

« باللغة البنغالية »

لياقت علي عبد الصبور

مراجعة: إقبال حسين معصوم

2010 - 1431

IslamHouse

মুসলমান-অমুসলমান সম্পর্কের সীমা

কুরআন মজীদের বিভিন্ন আয়াতে মুসলমানদেরকে অমুসলিমদের সাথে বন্ধুত্ব ও ভালবাসা স্থাপন করতে নিষেধ করা হয়েছে। এ থেকে স্বাভাবিকভাবেই সন্দেহ জাগতে পারে যে, ইসলাম তার অনুসারীদেরকে অন্য ধর্মাবলম্বীদের সাথে কোনরূপ সদাচারের অনুমতি দেয় না। ইসলাম ও মুসলমানদের স্বার্থেই এ সন্দেহের নিরসন হওয়া প্রয়োজন। বিশেষত সভ্যতার চরম উৎকর্ষের এ যুগে বিশ্ব মানব যখন একটি গ্লোবাল ফ্যামিলির রূপ ধারণ করেছে, যখন মনুষ্য সম্প্রদায় ও জাতিসমূহের আত্মনির্ভরতা অনস্বীকার্য পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে, তখন এ ধরনের সন্দেহ মুসলিম জাতির জন্য নিতান্ত অকল্যাণকর।

বস্তুত অমুসলিমদের সাথে মুসলমানদের সম্পর্ক কি হবে, তা সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে কুরআন ও হাদীসে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের আচরণ থেকে অমুসলিমদের সাথে সদ্ব্যবহার ও সদাচারের এমন ঘটনাবলী পাওয়া যায় যা অন্যান্য জাতি বা সম্প্রদায়ের ইতিহাসে একান্তই বিরল। কুরআনের আয়াতসমূহের প্রতি গভীর মনোযোগ সহকারে পূর্ণাঙ্গ তথ্য অনুসন্ধান করলে এ সম্পর্কিত ভ্রান্তির নিরসন হতে পারে। কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে অমুসলিমদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে নিষেধ করা হয়েছে ঠিকই। আবার অনেক আয়াতে তাদের সাথে সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। বন্ধুত্ব, অনুগ্রহ, সদ্ব্যবহার ও সমবেদনা–এ বিষয়গুলোর প্রত্যেকটির স্বরূপ বিশ্লেষণ করার পর কোন পর্যায়ে ইসলামের কি নির্দেশ রয়েছে তা ব্যক্ত হলেই অন্য ধর্মের অনুসারীদের সাথে মুসলমানদের সম্পর্কের সীমা চিহ্নিত করা সহজ হবে। মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ককে কতিপয় স্তরে বিভক্ত করা যায়। যথা : বন্ধুত্ব ও ভালবাসা, সমবেদনা, সৌজন্য ও আতিথেয়তা, সমঝোতা এবং লেনদেনের স্তর। প্রত্যেকটি স্তরের জন্যে ইসলামের বিভিন্ন নির্দেশ ও নীতিমালা রয়েছে।

বন্ধুত্ব : অমুসলিম ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের সাথে মুসলমানদের বন্ধুত্ব বা ভালবাসার সম্পর্ক স্থাপিত হতে পারে না। কারণ ইসলামের দৃষ্টিতে পৃথিবীতে মানুষের আগমন হয়েছে একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যকে সামনে রেখেই। অন্য প্রাণী, বৃক্ষ-লতা কিংবা জড়পদার্থের মত মানব জীবন ইহজগত সর্বস্ব নয়। যে উদ্দেশ্যে ও লক্ষ্যকে সামনে রেখে মানুষকে এ জগতে পাঠানো হয়েছে, মানুষের সার্বিক জীবনযাত্রা ও ক্রিয়াকলাপ তাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হতে হবে। আল্লাহর ইবাদত তথা দাসত্ব ও আনুগত্য মানব জীবনের লক্ষ্য। অতএব, তাতে ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে পারে, এমন কোন কাজ-কর্ম তার জন্যে অনুমোদিত নয়। অমুসলিম ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের সাথে বন্ধুত্বের ফলে মুমিনের ইবাদতে ব্যাঘাত সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। এ কারণে কুরআন মজীদের বিভিন্ন আয়াতে মুসলমানদেরকে অমুসলিম সম্প্রদায়ের সাথে বন্ধুত্ব ও ভালবাসার মত ঘনিষ্ঠতা গড়ে তোলার ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে। ব্যক্তিগত ও পারিবারিক পর্যায়ের চেয়ে সামাজিক পর্যায়ে অমুসলিম সম্প্রদায়ের সাথে মুসলমানদের আন্তরিক সম্পর্ক অনেক কুফল বয়ে আনতে পারে। ঘনিষ্ঠতার সুবাদে মুসলমানদের অভ্যন্তরীণ বিষয় অবগত হয়ে তারা এমন পদক্ষেপ নেয়ার সুযোগ লাভ করবে যাতে মুসলমানদের সমূহ বিপদ ঘটতে পারে। তাই সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে এ বিষয়ে খুবই সতর্কতার প্রয়োজন হয়। আধুনিক সভ্যতায় বিশ্বের রাষ্ট্রগুলো পরস্পরে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করার ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ না করলেও এ সম্পর্কে কেউ–ই একটি নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করতে দেয়া না। উদ্দেশ্যে একটাই। আর তা হচ্ছে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা।

সমবেদনা : সহানুভূতি প্রকাশ, হিত কামনা ও উপকার করার ক্ষেত্রে মুসলমান-অমুসলমানে কোন পার্থক্য নেই। যাদের সাথে মুসলমানদের যুদ্ধাবস্থা বিরাজমান এমন অমুসলিম ব্যতীত সবার প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করা যায়। অমুসলমানদের উপকার করার কোন বাধা তো নেইই–বরং ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসরত অমুসলিম জনগণ এক্ষেত্রে মুসলমান নাগরিকের সমান হকদার। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম নিজেদের জীবনে এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্তসমূহ রেখে গিয়েছেন। জনৈক ইহুদী বালক মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট আসা-যাওয়া করতো। একদিন তিনি ছেলেটিকে দেখতে না পেয়ে তার খোঁজ নিলেন। জানা গেল, ছেলেটি অসুস্থ। তিনি তৎক্ষণাত তার বাড়িতে গিয়ে তার সেবা-শুশ্রূষা করতে লাগলেন। এক পর্যায়ে তিনি তাকে ইসলামের দাওয়াত দিলে ছেলেটি তার পিতামাতার সম্মতিক্রমে মুসলমান হয়ে যায়। অমুসলিম নাগরিকের সেবা করার এমন প্রচুর ঘটনা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের জীবনে দেখা যায়। মক্কায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে সাহায্য প্রেরণ করেন। অথচ এরাই অমানুষিক অত্যাচার ও নিপীড়ন করে মুসলমানদেরকে দেশত্যাগে বাধ্য করেছিল। ওমর রা. মুসলমানদের মত অমুসলিম দরিদ্রদেরকেও বায়তুল মাল থেকে সহযোগিতা প্রদান করতেন। কুরআন মজীদে মুসলমানদের প্রতি এরূপই নির্দেশ রয়েছে।আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ لَّا يَنۡهَىٰكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمۡ يُقَٰتِلُوكُمۡ فِي ٱلدِّينِ وَلَمۡ يُخۡرِجُوكُم مِّن دِيَٰرِكُمۡ أَن تَبَرُّوهُمۡ وَتُقۡسِطُوٓاْ إِلَيۡهِمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُقۡسِطِينَ ٨ ﴾ الممتحنة: ٨

'যারা ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের সাথে যুদ্ধরত নয় এবং মাতৃভূমি থেকে তোমাদেরকে বহিষ্কার করেনি তাদের সাথে দয়া ও ন্যায়বিচারের ব্যবহার করতে আল্লাহ তোমাদের নিষেধ করেন না।' (মুমতাহিনা–৮)

ন্যায়বিচার ও সদ্ব্যবহারের ক্ষেত্রে ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসরত অমুসলিম, চুক্তিতে আবদ্ধ অমুসলিম এবং শত্রু অমুসলিম সবাই সমান। এমনকি জন্তু-জানোয়ারের সাথেও সুবিচার করার জন্যে ইসলামের নির্দেশ রয়েছে। তাদের পিঠে তাদের সাধ্যের অতিরিক্ত বোঝা চাপাতে নিষেধ করা হয়েছে।

সৌজন্য ও আতিথেয়তা : বাহ্যিক সদাচার ও সৌজন্যের ক্ষেত্রে অমুসলিমদের কোন শ্রেণীবিভেদ নেই। এমনকি যুদ্ধরত অমুসলিমরাও সৌজন্যমূলক ব্যবহার পাওয়ার যোগ্য। কাফেররা আত্মীয় হলেও তাদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করা যাবে না– এ নির্দেশ নাযিল হবার পর সাহাবায়ে কেরাম এই নিষেধাজ্ঞা কঠোরভাবে বাস্তবায়িত করেন। ফলে দেখা গেল, ঘরে ঘরে পিতা পুত্রের সাথে এবং পুত্র পিতার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করেছে। যদিও মানব প্রকৃতি ও সহজাত প্রবণতার জন্যে এরূপ করা সহজ ছিল না। কিন্তু সাহাবায়ে কেরাম আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূলের নির্দেশাবলী পালনের ব্যাপারে নিজেদের প্রবৃত্তি ও পারস্পরিক সম্পর্কের পরওয়া করতেন না। তাই আল্লাহ তাআলা তাদেরকে এ ব্যাপারে একটি মূলনীতি জানিয়ে দেন। বন্ধুত্ব ও আন্তরিকতা করতে নিষেধ নেই। বুখারী ও মুসনাদে আহমদ–এ বর্ণিত আছে, আসমা রা.–এর মাতা, আবু বকর সিদ্দীক রা.–এর স্ত্রী কবীলা হুদায়বিয়ার সন্ধির পর কাফের অবস্থায় মক্কা থেকে মদীনায় পৌঁছেন। তিনি কন্যা আসমার জন্যে কিছু উপঢৌকনও সাথে নিয়ে যান। কিন্তু আসমা রা. তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেন, আমার মাতা আমার সাথে সাক্ষাত করতে এসেছেন, কিন্তু তিনি কাফের। আমি তার সাথে কিরূপ ব্যবহার করবো? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, জননীর সাথে সদ্ব্যবহার করো।

মক্কা বিজিত হলে মহানবীর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতদিনকার শত্রু তাঁর করতলগত হয়ে যায়। কিন্তু তিনি তাদেরকে এই বলে মুক্ত করেছেন যে, তোমাদের উপর আজ আমার কোন অভিযোগ নেই। অর্থাৎ তোমাদের অতীত অত্যাচারের কোন প্রতিশোধ তো নেবই না, এমনকি সেজন্যে ভর্ৎসনাও করছি না। বদর যুদ্ধে যেসব কাফির বন্দী হয়ে এসেছিল, তিনি তাদের সাথে এমন ব্যবহার করেছিলেন, যা অনেক পিতাও পুত্রের সাথে করেন না।

আতিথেয়তার ব্যাপারেও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম মুসলিম-অমুসলিমের কোন বাছবিচার করতেন না। অমুসলিম ছাকীফ গোত্রের একটি প্রতিনিধি দল মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম –এর নিকট উপস্থিত হলে তিনি তাদেরকে মসজিদে নববীতেই অবস্থান করতে দেন। অথচ মুসলমানদের দৃষ্টিতে মসজিদ হলো সবচেয়ে সম্মানিত স্থান।

সমঝোতা : ধর্মীয় উপকার সাধন কিংবা অনিষ্ট থেকে আত্মরক্ষার প্রয়োজনে অমুসলমানদের সাথে সমঝোতায় উপনীত হওয়া বা শান্তিচুক্তি সম্পাদন করার কোন নিষেধ নেই। সূরা আলে ইমরানে– 'তবে যদি তোমরা তাদের পক্ষ থেকে কোন অনিষ্টের আশঙ্কা করো'– বলে সেদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এ কারণেই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও খোলাফায়ে রাশেদীন বিভিন্ন অমুসলিম জাতি-গোষ্ঠীর সাথে শান্তিচুক্তি সম্পাদন করেছিলেন। সমঝোতার মাধ্যমে যেমন বিপরীত পক্ষকে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়ে থাকে, তেমনি একই সাথে বিপরীত পক্ষের কাছ থেকে নিজেদের পক্ষের স্বীকৃতি আদায় করা হয়। তাছাড়া সমঝোতা ও শান্তির সম্পর্কের কারণে পরস্পরে মেলামেশার যে সুযোগ হয় তাতে মুসলমানদের উন্নত চরিত্র ও অনন্য বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অমুসলমানরা অবহিত হতে পারে। এতে তারা প্রভাবিত হয়ে ইসলামের

দিকে এগিয়ে আসবে। হুদায়বিয়ার সন্ধিতে যেসব শর্ত ছিল, তা বাহ্যত মুসলমানদের স্বার্থের পরিপন্থী হলেও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা মেনে নিয়েছিলেন। কুরআনেও এটিকে সুস্পষ্ট বিজয় নামে আখ্যায়িত করা হয়েছিল। ফল দাঁড়িয়েছিল এই যে, অল্পদিনেই অনেক কট্টর কাফের মুসলমান হয়ে যান। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক অমুসলিম রাষ্ট্রপ্রধানের নিকট ইসলামের দাওয়াত দিয়ে পত্র পাঠিয়েছিলেন। অমুসলিম গোত্র ও রাষ্ট্রের দূতদের সাথে তিনি সবসময় সৌজন্যমূলক ব্যবহার করতেন।

লেন-দেন : ব্যবসা-বাণিজ্য, ইজারা, চাকরি, শিল্প ও কারিগরির ক্ষেত্রে অমুসলমানদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা জায়েয। যদি এর কারণে মুসলমানদের কোন ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে তবে তা জায়েয থাকে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খোলাফায়ে রাশেদীন ও অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম কর্তৃক গৃহীত কর্মপন্থা থেকে এটি প্রমাণিত হয়। **ফকীহগণ** একারণেই যুদ্ধমান অমুসলিমদের হাতে সামরিক অস্ত্রশস্ত্র বিক্রয় করা নিষিদ্ধ করেছেন এবং শুধুমাত্র স্বাভাবিক ব্যবসা-বাণিজ্যের অনুমতি দিয়েছেন। তাদেরকে চাকরি প্রদান এবং তাদের প্রতিষ্ঠানে চাকরি করা মুসলমানদের জন্যে অবৈধ নয়।

ইসলামে অমুসলিমদের জন্যে উদারতা ও সদ্ব্যবহারের শিক্ষা রয়েছে। তাদের সাথে যদিও বন্ধুত্ব ও আন্ত রিকতার সম্পর্ক স্থাপন করতে নিষেধ করা হয়েছে, কিন্তু সহানুভূতি, সৌজন্য, আতিথেয়তা ও লেন-দেনমূলক আচরণ করতে নিষেধ করা হয়নি।

সমাপ্ত